গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা | ৬ - ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

চিন বিপ্লবের রূপকার মাও সে তুঙ-এর শিক্ষা থেকে

“চিনে মালিকানার প্রশ্নে মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। ...কিন্তু আজও ক্ষমতাচ্যুত জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির অবশেষ থেকে গেছে। এখনও বুর্জোয়া শ্রেণি আছে এবং পেটিবুর্জোয়া শ্রেণিকে ঢেলে সাজানোর কাজটা সবে শুরু হয়েছে। শ্রেণি সংগ্রাম কোনও মতেই শেষ হয়নি। বুর্জোয়া এবং প্রোলেটারিয়েটের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রাম, নানা রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে শ্রেণিসংগ্রাম, আদর্শগত ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রাম দীর্ঘদিন চলতেই থাকবে। সর্বদাই বহু আঁকাবাঁকা পথে তা এগোবে, কখনও তা অতি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ রূপ নেবে। প্রোলেটারিয়েট যেমন তার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিশ্বকে ঢেলে সাজাতে চায়, একই ভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির চেষ্টাও এটাই থাকে। এই কারণেই সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ—কে জিতবে সেই প্রশ্নটা আজও অমীমাংসিত।”

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩
৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

(জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের সঠিক পরিচালনা প্রসঙ্গে)

মেয়েরা ‘খাঁচা’র নিরাপত্তা চান না

মেয়েদের প্রথমে ঘরের ভেতরে ঢোকাবে, তারপর সিন্দুকের ভেতর ঢোকাবে, তারপর, হয়তো কোনও চেম্বারের ভেতর ঢুকিয়ে বলবে তোমরা মরো!— ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেছিলেন হাওড়ার তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। মেয়েদের সুরক্ষার অজুহাতে তাদের নাইট ডিউটি থেকে বাদ দেওয়ার যে সুপারিশ করেছে সরকার, সেই প্রসঙ্গে রাজ্যবাসীর প্রতিবাদী মনের কথাটি ধরা পড়েছে শিক্ষিকার এই বক্তব্যে। আর জি কর কাণ্ডের পর সম্প্রতি নবান্নের তরফে ১৭ দফা এবং কলকাতা পুলিশের তরফে ১৫ দফা গাইডলাইন প্রকাশ করে বলা হয়েছে সমস্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নাইট ডিউটি যতটা সম্ভব কম দিতে হবে। যেখানে তা সম্ভব হবে না, সেখানে মেয়েদের দলবদ্ধভাবে থাকতে হবে।

কোনও দায়িত্বশীল সরকার, কোনও প্রশাসন কি এমন ফতোয়া

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিচারের অঙ্গীকারে বহ্নিশিখারা

২৯ আগস্ট কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবসে তাঁর আহ্বান ‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’ স্মরণে রেখে তিলোত্তমার বিচার চাইতে মহিলাদের ‘অঙ্গীকার যাত্রা’ কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে শ্যামবাজারে শেষ হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মহিলা এতে অংশ নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, বিশিষ্ট চিকিৎসক নূপুর ব্যানার্জী, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব অনিতা রায়, অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত প্রমুখ কলেজ স্কোয়ারে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন এবং অঙ্গীকার যাত্রায় পা মেলান। আর জি কর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধা গোবিন্দ করের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, ‘শাড়িমোড়া যেন আনন্দশ্রী, দেখ বাংলার নারী/দেখনি এখনও ওঁরাই হবেন অসিলতা-তরবারি।’’ ২৯ আগস্ট নজরুল স্মরণদিবসে কলকাতার রাজপথে শাণিত তরবারির মতোই ঝলসে উঠলেন বাংলার হাজার হাজার নারী, রাজপথের কংক্রিট কেঁপে উঠল তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে— ‘আমরা বিচার চাই। উই ওয়ান্ট জাস্টিস।’ আরজি কর হাসপাতালের ভয়াবহ ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে এই বিশেষ দিনটিতে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মহিলারা, শিরোনামে ছিল বিদ্রোহী কবির সেই স্মরণীয় আহ্বান— ‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’।

শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধিকার অর্জনের পথ নারীদের জন্য বরাবরই বেশ কঠিন, দুর্গম। তবু সেই কঠিন পথ ধরেই যুগে যুগে দেশে-বিদেশে নারীরা এগিয়েছেন, সমস্ত

আটের পাতায় দেখুন

● আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা কী বলছেন
তিনের পাতায়

নারীসমাজ সহ নাগরিকদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভূমিকাকেঅভিনন্দন

এসইউসিআই(সি)

যথার্থই স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা। উত্তাল বাংলা, উত্তাল সমগ্র দেশ। প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ ইউরোপে, আমেরিকায়। একটাই দাবি, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আর জি কর হাসপাতালের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ছাত্রীর নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের বিচার চাই। নেপথ্যে থাকা প্রকৃত দোষীদের আড়াল করা চলবে না। তদন্তের নামে খুনের প্রমাণ লোপাট করা চলবে না।

শুধু ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীই নয়, প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের হাজারে হাজারে ছাত্রছাত্রী, আইনজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, আর্টিস্ট, সকল পেশার নাগরিক, কর্মরত শ্রমিক, গ্রামের কৃষক, এমনকি প্রথম সারির ফুটবল দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকরা। বোঝা যায় রাজ্যে পর পর ক্ষমতাসীন শাসকরা পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী প্রাণসত্তাকে আজও সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। এটাই আশা জাগায়, প্রেরণা সঞ্চারিত করে।

সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ১৪ আগস্ট মধ্যরাত। সামান্য বিজ্ঞপ্তির আহ্বানে অসামান্য সমাবেশ। পুরুষ শাসিত সমাজে অপশাসিত, লাঞ্ছিত, দমিত, দুর্বল বলে গণ্য কয়েক লক্ষ নারীশক্তি প্রবল বলিষ্ঠতায়, অদম্য তেজে মধ্যরাতে শহরে, গ্রামে গঞ্জে প্রতিবাদে

সাতের পাতায় দেখুন

ডাঃ সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতারি চিকিৎসক ও নাগরিক আন্দোলনের জয়

ডাঃ সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতারি সম্পর্কে ২ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,

দুর্নীতি মামলায় হলেও অবশেষে আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার সহ নাগরিক প্রতিবাদের জয়। যদিও আর জি কর-এর নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি, যেটি ছিল আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশা। সাথে সাথে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন সেটাও কার্যকর হওয়া অবশ্যই উচিত ছিল।

মেয়েরা ‘খাঁচা’র নিরাপত্তা চান না

একের পাতার পর

দিতে পারে! এ তো মাথাব্যথা সারাতে মাথা কেটে ফেলার সামিল! এরকম নির্দেশ জারি করার মানে দাঁড়ায়, সমাজ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে বর্বর অমানুষের দল, তাদের হাত থেকে বাঁচতে মেয়েদের থাকতে হবে লোহার খাঁচায়, ভয়ে ভয়ে, সাবধানে! শুধু হাসপাতালের নার্স কিংবা ডাক্তার অথবা স্কুলের শিক্ষিকা নয়, আইটি সেক্টর থেকে বিমান চালনা, অফিসের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হকারি, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সর্বত্রই মেয়েরা আজ যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সরকারের এই ফরমান অনুযায়ী হাসপাতালে যদি রাতের শিফটে পুরুষ নার্সই রাখতে হয়, তা হলে রোগিনীরা কি দলবদ্ধভাবে বেডের ওপর বসে থাকবেন? মাঝরাতে কোনও গ্রামের মহিলার প্রসব বেদনা উঠলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আশা দিদি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে দলবল ডাকতে ছুটবেন? রাতের শিফটে কাজ করা সাংবাদিক থেকে কারখানা কর্মী, স্টেশনে সবজি বিক্রি করে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা মহিলারা দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঘরের কোণে গিয়ে মুখ লুকোবেন? মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে চলা স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং পুলিশের শাসনে মহিলা পুলিশ কর্মীরাও কি এই নির্দেশিকা মেনে সন্ধ্যা নামলেই ঘরে সেঁধোবেন? তাতেই রাজ্যে নারী সুরক্ষার বান ডাকবে? এমনিতেই তো সরকারি মদতে মদ, মাদকের প্রসার, পাড়ায় পাড়ায় শাসক দল-পুষ্ট দুষ্কৃতী বাহিনীর যথেচ্ছ দাপট, অবাধে ব্লু-ফিল্ম, পর্নো-র‍্যাকেট চলতে দেওয়া, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ সিনেমা ও বিজ্ঞাপনের ব্যাপক প্রসার— সব মিলিয়ে সমাজ পরিবেশে মেয়েদের নিরাপত্তা বিপন্ন করার ব্যবস্থা শাসকরা করেই রেখেছে।

তার উপর এমন অদ্ভুত ‘সুরক্ষাবিধি’ চালু করে প্রকারান্তরে সরকার এবং পুলিশের কর্তারা মেনেই নিচ্ছেন যে তাঁরা চরম অপদার্থ! তাঁরা এ-ও মানছেন, পশ্চিমবঙ্গে নারীর নিরাপত্তা একেবারে তলানিতে নেমেছে!

সরকার ‘সেফ জোন’ তৈরি এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষার বাণী দিয়েছে। মেয়েরা কোন লোহার বেড়ার আড়াল পেলে তবে ‘সেফ’ থাকবেন? যেখানে একজন ডাক্তার তাঁর নিজের হাসপাতালে নিরাপদ থাকতে পারলেন না, সেখানে কোন সেফ জোনের গল্প শোনাচ্ছে সরকার? আর মোবাইল অ্যাপ? যে সবজি বিক্রেতা, পরিচারিকা, আয়ার কাজ করা মহিলারা গভীর রাতের ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরেন তাঁরা দিনের রোজগারে দু’মুঠো চাল কেনার হিসাব কষতে কষতেই রাস্তা চলেন। কোথায় পাবেন তাঁরা স্মার্ট ফোন, অ্যাপ? যেখানে রাতের ট্রেন থেকে শুরু করে শহরের রাস্তায় এমনকি থানার ভেতরেপর্যন্ত পুলিশই ভক্ষক, সেখানে কোনটা সেফ জোন?

এর সাথে মিলেছে সমাজ মননে গেড়ে বসে থাকা বস্তাপচা ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামির পরিমণ্ডল এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার আধিপত্য। এর দ্বারা প্রভাবিত উচ্চপদস্থ আমলা থেকে বিচারব্যবস্থার বহু উচ্চ পদাধিকারীও। তা না হলে সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ মিলে এমন উদ্ভট নির্দেশিকা জারির কথা কি ভাবতেও পারত! এ যেন সেই প্রাচীন কালের নিদান, মনুর বিধি মেনে যেখানে পথে নারী ছিলেন ‘বিবর্জিতা’। এর আশু ফল হিসাবে মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগটাই কমার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি! এমনিতেই এ দেশে কর্মক্ষম মেয়েদের কাজের জগতে প্রবেশের হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম। পুরুষ-নারীর মজুরির হারেও আছে চূড়ান্ত বৈষম্য। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের গড় বেতন অনেকটাই কম। গার্হস্থ্য কাজ, বিনা বেতনে পারিবারিক কুটির শিল্প ইত্যাদি সামলানোতে মেয়েদের সংখ্যা এ দেশে অত্যধিক বাড়ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, সন্তানের দেখাশোনার জন্য মায়েদের দায়িত্ব, এগুলিকে বহু কোম্পানি মালিকই বাড়তি ঝামেলা হিসাবে দেখে মেয়েদের কাজ থেকে বাতিল করতেই উন্মুখ। এ বার সুরক্ষার অজুহাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যে সুপারিশ করছে তাতে এ রাজ্যের মেয়েদের কর্মহীনতা আরও বাড়বে না কি?

দিল্লির নির্ভয়ার ঘটনার পর ভার্মা কমিশনের সুপারিশে নির্ভয়া তহবিলের মাধ্যমে নারী সুরক্ষার জন্য অনেক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল। কিছু বিজ্ঞাপন ছাড়া কেন্দ্র রাজ্য কোনও সরকারই বিশেষ কিছু করেনি। এই তহবিলের টাকায় এ রাজ্যে নারী ও শিশু নির্যাতনের দ্রুত বিচারের জন্য ১২৩টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, পকসো আদালত তৈরির সংস্থান ছিল। হয়েছে মাত্র ৬টি। অথচ রাজ্য সরকারের কর্তারা ‘কড়া আইনে’র জন্য গলা ফটাচ্ছেন! কর্মস্থলে মেয়েদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার, সুরক্ষিত রাত্রিনিবাস করার কোনও চেষ্টা রাজ্য সরকার করেছে? একজন মহিলা ডাক্তারও তাঁর কর্মস্থলে মেয়েদের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষ কিংবা শৌচাগার পাচ্ছেন কি? দায়টা তবু মেয়েদেরই নিতে হবে!

তা ছাড়া, মেয়েরা কি বাইরে কাজ করে বলে অসুরক্ষিত? ঘরে তাঁরা আক্রান্ত হন না? পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে ঘরে মেয়েদের ওপর আক্রমণের ঘটনা কোনওমতেই কম নয়। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, ‘‘নারীকে যদি মুক্ত করতে হয়, তাকে যদি পুরুষের সমান করতে হয়, তবে সামাজিক উৎপাদনী শ্রম থেকে সরিয়ে রেখে ব্যক্তিগত ঘর-গৃহস্থালীর কাজে তাদের আটকে রেখে তা কখনওই করা যাবে না। নারীর মুক্তি একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন নারী বৃহদায়তন উৎপাদনের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং ঘর-গৃহস্থালীর কাজে তাকে খুব সামান্য সময় ব্যয় করতে হবে’’ (পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)। আজকের দিনের পরিস্থিতি এর ঠিক বিপরীত। একদিন বুর্জোয়া বিপ্লবই ব্যক্তির মুক্তির সাথে সাথে নারীমুক্তির স্লোগান তুলেছিল। আর আজ ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ব্যক্তির অধিকারকে যেমন সর্বত্র গলা টিপে মারতে চাইছে, একই ভাবে নারীকেও সে ঘরে ঢোকাতে চাইছে, পুরুষের ভোগের বস্তু করে রাখতে চাইছে। সে জন্য একচেটিয়া পুঁজি তথা সাম্রাজ্যবাদের সংকট মোচনের জন্য উদ্ভূত ফ্যাসিবাদী চিন্তার অন্যতম উদ্গাতা হিটলারের স্লোগান ছিল ‘উইমেন ব্যাক টু কিচেন’।

এই ভারতে দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের পর ওই হিটলারের অন্যতম অনুগামী হিসাবে পরিচিত সংগঠন আরএসএস-এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবত ধর্ষণের জন্য মেয়েদের বাইরে বেরনোকেই দায়ী করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশে হাথরসের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর তাঁর শিষ্য বিজেপি নেতাদের গলাতেও ছিল একই সুর। পচা-গলা পুঁজিবাদী সংস্কৃতিই যে ধর্ষকের জন্ম দিচ্ছে, এই সত্যকে আড়াল করতে পুঁজিবাদের সেবাদাস দলগুলো কখনও নারী নিরাপত্তার অভাবের জন্য মেয়েদেরই দায়ী করে, কখনও ‘নির্দেশিকা’র নামে মেয়েদের এক সদা-সাবধানী ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন কাটানোর বিধান দেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের এই ফতোয়াও তার ব্যতিক্রম নয়।

মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, “সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে, সে-সম্বন্ধে বোধকরি মতভেদ থাকিতে পারে না” (নারীর মূল্য)। আজ চরম সামাজিক অবক্ষয় যা নারী নিরাপত্তাকে শোচনীয় পরিস্থিতিতে নিয়ে যাচ্ছে, সেই অবক্ষয় একই সাথে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপর্যয় ডেকে আনছে। বহু পরিবারে শিশুরা পর্যন্ত যৌন বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ছে। পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে।

নারীকে ঘরের কোণে ঢুকিয়ে দিলে তা সমাজের অর্ধেক নয়, পুরো আকাশেই দুর্যোগের ঘন কালো মেঘ ডেকে আনবে। তাই নির্যাতিতার খুন ধর্ষণের বিচার চেয়ে যে আন্দোলনে নারী-পুরুষ একত্রে নিরাপদেই বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে রাস্তায় — সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই অসুস্থ সমাজটাকেই বদল করার লক্ষ্যে। নিজেদের আখের গোছানো এবং সরকারি গদিলাভের সংকীর্ণ স্বার্থে কেউ যাতে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে না পারে খেয়াল রাখতে হবে সে দিকেও।

জীবনাবসান

দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৬ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

তিনি ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মী। ১৯৬৬ সালে দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের লাঠি ও গুলিতে দুজনের মৃত্যু হয়, আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে ইস্পাত নগরী দুর্গাপুর। কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী সেই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। সেই সময় তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় দলের জেলা কমিটির প্রয়াত সদস্য সুনীল পালের, যার মাধ্যমে তিনি রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড বাদশা খানের সংস্পর্শে আসেন ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে দলের কাজে নিজেকে যুক্ত করেন এবং দীর্ঘদিন পার্টি সেন্টারে থেকেই দলের কাজকর্ম করতেন। সেই সময় থেকে আমৃত্যু ছিলেন দলের একজন সক্রিয় সদস্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিজের কাজের ক্ষেত্র ইনস্ট্রুমেন্ট ডিপার্টমেন্টেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই সময় বেশ কিছু সহকর্মীকে ইউনিয়ন ও পার্টির কাজে যুক্ত করতে তিনি সক্ষম হন। ১৯৭০-এর দশকে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব সিপিএম ইস্পাত শহরে কায়েম করেছিল তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শহরের একটা অংশ সিপিএমের সন্ত্রাসমুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর সাহসিকতা ও নেতৃত্বকারী ভূমিকা আজও স্মরণীয়। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও দরদি মনের কারণে যাঁদের সাথেই মিশতেন, তাঁদের উপর একটা প্রভাব ফেলতে সমর্থ হতেন। কুরুরিয়া ডাঙায় একটি ক্লাবের তিনি ছিলেন আমৃত্যু সর্বজনশ্রদ্ধেয় সভাপতি। নিজের পাড়াতেও ছিলেন সকলের অত্যন্ত কাছের মানুষ। পাড়ায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাতে পাড়ার কিছু লোক কলকাতায় রওনা হন এবং তাঁর মরদেহের সাথেই দুর্গাপুরে ফেরেন। পাড়ায় তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু মানুষ। মা-বোনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বহু মানুষ মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর মরদেহ কুরুরিয়া ডাঙায় তাঁর প্রিয় ক্লাবে পৌঁছালে সেখানেও বহু মানুষ এসে মালা দিয়ে চোখের জলে শেষশ্রদ্ধা জানান। অনেকেই তাঁর শববাহী গাড়ির সঙ্গে জেলা অফিসে উপস্থিত হন। তখন জেলা অফিসে অধীর প্রতীক্ষায় হাজির ছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য নেতা-কর্মী।

জেলা অফিসে প্রয়াত কমরেডকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমে মাল্যদান করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ভীম দে। এরপর পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড স্বপন ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী ও রাজ্য কমিটির সদস্য, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কমরেড রতন কর্মকার, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বদরোদ্দোজা, কমরেড সুব্রত বিশ্বাস এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এ এল গুপ্তার পক্ষে মাল্যদান করা হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী ও জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং উপস্থিত কমরেডরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা এবং শ্রেণি ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য কমরেড ও সুহৃদবৃন্দ। তাঁর শেষযাত্রায় দলের নেতা-কর্মী ও সুহৃদবৃন্দ পা মেলান।

কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী লাল সেলাম

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা কী বলছেন

আর জি কর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনায় আন্দোলনরত বিভিন্ন হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকদের কাছে ১ সেপ্টেম্বর আমরা গণদাবীর পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম। উত্তরে তাঁরা যা বলেছেন, তা পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

আর জি করের স্নাতকোত্তর ছাত্রী-চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যুর বিচার চেয়ে দেশ জুড়ে, এমনকি দেশের বাইরেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলন এমন সর্বব্যাপক হওয়ার কী কারণ বলে আপনাদের মনে হয়?

আর জি করের ঘটনার সূত্রপাত ৯ আগস্ট। হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন স্নাতকোত্তর বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ বিভাগের সেমিনার রুমে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কর্তব্যরত একজন চিকিৎসকের উপর, যিনি টানা ৩০-৩৬ ঘণ্টা ধরে ডিউটি করছিলেন। তাঁর এমন মর্মান্তিক মৃত্যু প্রত্যেক বাবা-মায়ের মনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে যে, তা হলে কি তাঁর মেয়ে কর্মস্থলেও নিরাপদ নয়? অথচ বাড়ি এবং কর্মস্থল— এই দুটো তো একে অপরের পরিপূরক। কর্মস্থলকেই মানুষের দ্বিতীয় বাড়ি বলা চলে।

একজন কর্তব্যরত চিকিৎসক, যিনি প্রতি মুহূর্তে অন্যের প্রাণ রক্ষা করেন, কর্মস্থলেই তাঁর এমন নির্মম হত্যার ঘটনা কিন্তু অপরাধের সমস্ত সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। ঘটনার এই গভীরতা, যা প্রথম জুনিয়র চিকিৎকরা, তাঁর সহকর্মীরা উপলব্ধি করে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা আজ গোটা সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

মানুষ দেখেছে হাথরস, উন্নাও, কাঠুয়া, মহিলা কুস্তিগির থেকে শুরু করে বানতলা, কামদুনি, পার্কস্ট্রিট— কোনও ঘটনারই বিচার নির্যাতিতারা পায়নি। মানুষের মধ্যে বিচার না পাওয়ার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত অবস্থায় ছিল। সেই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটেছে চিকিৎসকের এই হত্যার ঘটনায়। আর জি কর কোনও গ্রামীণ হাসপাতাল নয়, রাজধানী কলকাতা মহানগরীর প্রথম শ্রেণির কয়েকটি হাসপাতালের একটি। সেখানে এই ঘটনা ঘটেছে! সেখানে সিসি ক্যামেরা, পুলিশ আউটপোস্ট এবং সিকিউরিটি গার্ডেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এই ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও একজন মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষিতা হতে হল, খুন হতে হল! এটা তো বাইরে থেকে এসে কেউ ঘটিয়ে দিতে পারে না। তা হলে কারা এর পিছনে রয়েছে? তাদের মোটিভ কী? এই সব প্রশ্ন যেমন আর জি করের আন্দোলনরত চিকিৎসকরা তুলছেন, তেমনই বাংলার মানুষ তুলছেন, সারা দেশের মানুষ তুলছেন। তেমনই শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি সহ সর্বত্র মানুষ এই প্রশ্ন তুলছেন।

এই যে মানুষের আন্দোলন, যা ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য, দেশের সীমাকে অতিক্রম করে, এর কোনও প্রভাব কি তদন্তের উপর পড়বে বলে আপনারা মনে করেন?

আমরা আজ যে সমাজব্যবস্থায় রয়েছি সেখানে যা কিছু আইনসঙ্গত, তা সব সময় ন্যায়সঙ্গত নয়, আবার যা কিছু ন্যায়সঙ্গত তা আইনসম্মত নয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বিচার কিনতে হয়। আজ যে কোনও কোর্ট, তা লোয়ার কোর্ট, হাইকোর্ট হোক বা সুপ্রিম কোর্ট, তার জন্য আমাদের আইনজীবী নিয়োগ করতে হয়। তার যে বিপুল খরচ, তা বহন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে প্রতিটি বিচারকে কি সুবিচার বলা যায়? সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা মনে করি, এই আন্দোলন একটা ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন। এবং এই দাবির সঙ্গে দেশের মানুষ তাদের দাবিকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। তাদের দাবির সঙ্গে আর জি করের বিচারের দাবি এক হয়ে গেছে। তা থেকে যে জনরোষের জন্ম হয়েছে, সেই জনরোষ আমরা দেখছি প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তার জন্যই প্রশাসন অনেকটা পিছু হঠেছে।

এর আগেও আমরা দেখেছি, আন্দোলনকে নানা ভাবে ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু জনরোষের চাপে আজ সরকার তথা প্রশাসনও বিচার চাইছে। যদিও এটা আই-ওয়াশ বলেই আমাদের মনে হয়। চিকিৎসক সমাজ সহ ব্যাপক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনের চাপেই সরকারি দল বিচার চাইতে বাধ্য হয়েছে। যে সরকারি ব্যবস্থার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছে, সেই সরকারই আজ বিচারের দাবি তুলছে। কিন্তু তারা এই ঘটনার দায় নিতে রাজি হচ্ছে না। নিহত চিকিৎসক তো সরকারি চিকিৎসক ছিলেন, সরকারই তাঁকে নিয়োগ করেছিল এবং তিনি সরকারি হাসপাতালেই কাজ করতেন। তা হলে এই ঘটনার দায় সরকার নেবে না কেন? কিন্তু আন্দোলনের চাপে কিছু দাবি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। প্রথমে শরীর খারাপ বলে বাড়িতে খবর দেওয়া, তারপর আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা, এফআইআর করতে দেরি করা, এই ভাবে প্রথম থেকেই পুলিশ-প্রশাসন ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। যখন জনসাধারণ এই দাবিটির সাথে একাত্ম হল এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাস্তায় নামল, তখন কিন্তু প্রশাসন চাপে পড়ে গেল। তখন হাইকোর্ট কেসটাকে টেক-ওভার করল এবং তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল। তারপর সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে কেসটা গ্রহণ করল।

ফলে এটা পরিষ্কার, কী রাজ্য সরকার, কী কেন্দ্রীয় সরকার— সবার উপরেই কিন্তু আন্দোলনের একটা ভাল রকম চাপ পড়েছে। তারা বাধ্য হয়েছে ঘটনাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে। ফলে বিচারব্যবস্থার উপর ভরসা রাখলেও একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝতে হবে, আন্দোলন না থাকলে ন্যায়বিচার হবে না।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কি অপরাধ প্রতিরোধের শক্তিও শক্তিশালী হচ্ছে?

ঘটনাপ্রবাহ যত এগোচ্ছে, সেটা ততই স্পষ্ট হচ্ছে। দলমত, জাতি-ধর্মের বেড়া ভেঙে মানুষ আজ রাস্তায় নেমেছে, মিছিল করছে। ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব রাতে মহিলাদের রাত দখলের কর্মসূচিতে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় মানুষের ঢল রাস্তায় নেমেছিল। রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা ভারতে তো বটেই, বিদেশের মাটিতেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর উঠেছে। আমাদের মনে হয় না, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কখনও এত মানুষ একসাথে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আমরা আরও দেখেছি, বিক্ষোভের ভয়ে সরকারের ডার্বি ম্যাচ বাতিল করার প্রতিবাদে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল টিম ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, তার সাথে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অগণিত সমর্থক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পুলিশের লাঠির সামনে দাঁড়িয়ে। দেখা গেল এক দলের সমর্থকের কাঁধে চেপে আর এক দলের সমর্থক প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এই ঘটনা বিরল, কেউ আগে দেখেনি। স্লোগান উঠেছে 'ঘটি-বাঙাল এক স্বর— জাস্টিস ফর আর জি কর'।

আমরা দেখলাম, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের প্রতিবাদ জানানোর উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আনল— বলল, তারা সরকারি কর্মসূচি ছাড়া অন্য কিছুতে অংশ নিতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই অনেক স্কুলে তালা দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে গেল এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আন্দোলনটাকে সমর্থন করলেন।

এমন বহু ঘটনা আছে। আর জি কর মেডিকেল কলেজের ধর্না মঞ্চে থাকার সময় দেখেছি, সমাজের নানা স্তরের মানুষ সেখানে আসছেন, বুদ্ধিজীবীরা আসছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসছেন। লেখক-কবিরা তাঁদের লেখা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা পাঠাচ্ছেন ধর্না মঞ্চে। গায়করা সংহতি বার্তা জানাচ্ছেন। এ ছাড়াও 'বিশেষভাবে সক্ষম' মানুষরাও মিছিলে হাঁটছেন। সমাজে ব্রাত্য যে ট্রান্সজেন্ডাররা, তাঁরাও মিছিল করছেন। আইনজীবীরা, সাংবাদিকরা মিছিল করছেন। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে আমরা মনে করি এই আন্দোলন মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলেছে, বিবেককে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রতিবাদের ভাষাকে সবার সামনে তুলে ধরার পথটাকে সহজ করেছে।

শুনেছি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরী বলতেন। কারণ প্রচুর মিছিল হত। এখানেও আমরা দেখতাম মিছিল হলেই কিছু মানুষ বিরক্ত হতেন— আবার রাস্তা জ্যাম! খবরের কাগজ মিছিলের আসল দাবি বাদ দিয়ে লিখত— যান জট। কিন্তু এখন প্রচুর মিছিল হচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ বাসে, ট্যাক্সিতে বসে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন। বলছেন, মিছিলটা হওয়া উচিত। অনেকেই মনে করছেন আমি এই মিছিলটায় যেতে পারলাম না, গেলে ভাল হত। নাক উঁচু মানুষ বলা হত যাঁদের, তাঁরাও আজ মিছিলে নামছেন। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা, তাঁদের আন্দোলনে যেতে না দেওয়ার জন্যে যে অপপ্রচার চলে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন।

এই আন্দোলন এমন একটা জায়গায় গেছে এবং মানুষকে নিয়ে যেতে পেরেছে, উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে মানুষ প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, এটাই আমাদের আশা।

অভিযোগ উঠেছে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনার প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে। আপনাদের অভিমত কী?

৯ আগস্ট যখন সেমিনার রুম থেকে দেহ উদ্ধার হয়, তারপর কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাবা-মায়ের কাছে ফোন যায়। যেটা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। প্রথমে বলা হয়, তাঁর শরীর খারাপ, এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরে বলা হয়, উনি আত্মহত্যা করেছেন। তারপরে বলা হয়, আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, আমরা সবকিছু বলব— এখান থেকে শুরু। এই ঘটনার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের যে তদন্তকারী দল আসে, তাদের আচরণ, শরীরী ভাষা ছিল অত্যন্ত গা-ছাড়া— যেন কিছুই হয়নি! সেখান থেকেই আমাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে যে, এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কিছু বিষয় আছে, যেটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

তড়িঘড়ি দেহ সরিয়ে পোস্টমর্টেমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলে, তখন বাধা দেওয়া হয়। জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি জানান ম্যাজিস্ট্রেটকে আসতে হবে, তাঁর তত্ত্বাবধানে সুরতহাল এবং পোস্টমর্টেম হবে। ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে, সাক্ষীর উপস্থিতিতে পোস্টমর্টেম করতে হবে। এই সব দাবি উঠতে থাকে। পোস্টমর্টেমের পরই তড়িঘড়ি মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে শাসকদলের বিধায়কের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। নির্যাতিতার বাবা-মা সংবাদমাধ্যমে এ কথাও বলেছেন, তাঁরা বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ দেহ নিয়ে রওনা হয়ে যায়। আরও দেখুন ১৪ তারিখ রাতের ঘটনা— একদল সশস্ত্র গুন্ডা, তাদের কারও হাতে কাটারি ছিল, কারও হাতে লোহার রড, কারও হাতে আরও ধারাল অস্ত্র, তারা প্রতিবাদী মঞ্চটাকে ভাঙচুর করে, আর জি করের ইমারজেন্সিটাকে পুরো তছনছ করে দেয়, উপরের দুটো ঘর ভাঙচুর করে। তারা চলে যায় চেস্ট মেডিসিনের সেমিনার রুমের কাছে। তারা হোস্টেলে ঢুকে নার্সদের মারাত্মক হুমকি দেয়। যে ভাবে পুরোটা ঘটেছে তাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা এটি পুরোপুরি পরিকল্পিত ছিল।

সেই সময় পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে থাকা পুলিশ কর্মীরা আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রী ও সিস্টারদের কাছে লুকনোর জায়গা খুঁজতে থাকে। প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট ধরে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালালেও সেই সময় কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানো হয়নি। সদর্থক ভূমিকা নেওয়া দূরে থাক, আন্দোলনকারী ছাত্ররা বারবার পুলিশকে ফোন করলেও তারা তা রিসিভ পর্যন্ত করেনি। সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট পেশ করার সময় বলেছে, আমরা ঘটনার পাঁচদিন পর অকুস্থলে যাই। তখন সেমিনার রুম এবং আশেপাশের জায়গা আর আগের মতো নেই। ফলে এটা খুবই স্পষ্ট যে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে। এটাতে প্রমাণিত যে প্রশাসন এবং পুলিশ যারাই তদন্তের দায়িত্ব ছিল এবং তৎকালীন কলেজ

চারের পাতায় দেখুন

কী বলছেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা

তিনের পাতার পর

কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রমাণ লোপাট করতে সাহায্য করেছে।

সেমিনার রুম লাগোয়া একটা ঘর ভাঙার খবর সংবাদে এসেছে। তার সাথে কি প্রমাণ লোপাটের কোনও যোগ আছে বলে মনে হয়?

থাকতেই পারে। কারণ সেমিনার রুমের লাগোয়া স্লিপ-স্টাডি রুম আছে। ডাক্তারদের যেহেতু আলাদা কোনও রেস্ট রুম নেই, তাই স্লিপ-স্টাডি রুম ফাঁকা থাকলে, ডাক্তাররা ওই ঘরে বিশ্রাম নেন। কিছু ডাক্তার সেমিনার রুমেও বিশ্রাম নেন। ওই স্লিপরুমের পাশে একটা বাথরুম ছিল। এই দুটো জায়গাই মেরামতির নামে ভাঙা শুরু হয়। প্রশ্ন এটাই উঠছে, যেটা ক্রাইম স্পট, যে জায়গাটা নিয়ে এত বিতর্ক— সেই চেস্ট মেডিসিন ডিপার্টমেন্টেই কেন মেরামতির কাজ শুরু করা হল? প্রশ্ন উঠছে, এমন কোনও প্রমাণ কি ওখানে ছিল যেটাকে লোপাট করার চেষ্টা হচ্ছে? তদন্তে তা যেন সামনে না আসে, তার চেষ্টা হচ্ছে কি? কী তার মোটিভ? কে নির্দেশ দিল ভাঙার? আজও কিন্তু সেটা জানা যায়নি। আমরা দাবি তুলেছি— তদন্তের আওতায় এটাকেও আনতে হবে এবং যিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকেও তদন্তের আওতায় আনতে হবে।

জুনিয়র ডাক্তাররা এতে বাধা দিয়েছিলেন?

একদমই তাই। জুনিয়র ডাক্তাররা যেহেতু আন্দোলনে চলে এসেছিলেন, তাই ওয়ার্ডের ভিতরে কী হচ্ছে তাঁরা প্রথমে তা জানতে পারেননি। জানার পরেই তাঁরা বাধা দেন এবং কাজ আটকে দেন। স্বাভাবিক তদন্ত হলে ঘটনার প্রথম দিন থেকেই পুলিশের উপর দায়িত্ব বর্তায় 'ক্রাইম স্পট' অপরিবর্তিত রাখার। তার আশেপাশেও যাতে কোনও পরিবর্তন না করা হয়ে সেটা তাদেরই দেখার কথা। পুলিশ ওখানে থাকা সত্ত্বেও ভাঙার কাজটা হল! তা হলে তো বলতেই হয়, কোনও না কোনও ক্ষমতাশালী সেখানে যুক্ত আছেন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বৃহৎ দুর্নীতিচক্র এবং অপরাধ চক্রের যুক্ত থাকার কথা বার বার সামনে আসছে। এই আন্দোলন কি তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারছে?

অবশ্যই, এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হচ্ছে। প্রফেসর ডাঃ সন্দীপ ঘোষ স্যারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে— হুমকি দেওয়া, ফেল করিয়ে দেওয়া, পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য টাকা নেওয়া থেকে শুরু করে আরও নানা দুর্নীতির বিষয় আসছে। এগুলি কিন্তু শুধু আরজি কর মেডিকেল কলেজেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দুর্নীতিচক্র পশ্চিমবঙ্গের অনেক মেডিকেল কলেজেই ছড়িয়ে আছে। আমরা মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে নানা দুর্নীতিচক্রের কথা আগে তুলেছি, সংবাদমাধ্যমও এখন তা বলছে। এর আগেও প্রফেসর সন্দীপ ঘোষ স্যারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তা নিয়ে তদন্ত কমিটিও তৈরি হয়েছিল। যদিও আমরা জানতে পেরেছি সেই কমিটির অনেক সদস্যই ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন। নানা রকমের আর্থিক দুর্নীতিরই অভিযোগ উঠেছিল। একটা তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই তদন্ত কমিটির কাজের অগ্রগতি কী হয়েছে, কারও জানা নেই। অর্থাৎ এই আর্থিক দুর্নীতি চলছে আগে থেকেই। সরকার শুধু তদন্ত কমিটি তৈরির কাজটুকুই করেছিল। কিন্তু তার রিপোর্ট নেওয়া এবং তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ কী নেওয়া হয়েছে— কিছুই প্রকাশ্যে আসেনি। আন্দোলনরত পড়ুয়া ডাক্তাররা বলছেন, এইসব চক্র যতক্ষণ না সমূলে উচ্ছেদ হচ্ছে, ততক্ষণ বার বার এই ধরনের দুর্নীতি হতে থাকবে। আর জি করের ঘটনার মোটিভ এই দুর্নীতি চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে। সেই মোটিভটা সামনে আসা দরকার। জানা দরকার এই ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্য কী ছিল।

এরই সাথে মেডিকেল কলেজগুলোতে যে সব দুষ্টচক্র চলছে, সেগুলিকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যে বা যারা এ সবের সঙ্গে যুক্ত তাদের সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং যদি তারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সে জন্যই আন্দোলন থেকে প্রফেসর ডাঃ সন্দীপ ঘোষের সাসপেনশন, পদত্যাগের দাবি উঠেছে। যাতে আগামী দিনে তাঁকে কোনও উচ্চ পদে না বসানো হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ১৪ আগস্ট আর জি করে হামলার জন্য যে পুলিশ কমিশনার দায়ী, তাঁরও সাসপেনশন দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুষ্টচক্র যাতে পুরোপুরি বন্ধ করা যায় তার দাবি জানানো হয়েছে।

এর আগে ২০০১ সালে আর জি করে এক ডাক্তারি ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল। যদিও তাঁর পরিবার এবং সহপাঠীরা একটি বিশেষ চক্রের দিকে আঙুল তুলেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সরকার তাতে কান দেয়নি। সেই ঘটনায় যে চক্রের কথা উঠেছিল সেই ধরনের চক্রই ডালপালা মেলে আজ এমন ঘটনা ঘটাতে পারে বলে কি আপনারা মনে করেন?

দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র আছে কি নেই, সেটা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে আন্দোলনের মঞ্চ থেকে আমরা এটুকু বলছি যে, এবারের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। দুর্নীতি চক্র চলতে চলতে, বার বার অপরাধের ঘটনা ঘটতে ঘটতে আজ তা সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যে শাসক দলই ক্ষমতায় থাক, তারা দোষীদের আড়াল করে বলেই এই ধরনের ঘটনা বার বার ঘটছে। ফলে সরকার, প্রশাসন যারা চালায়, তাদের উদ্দেশ্য কী, সেটা জানা দরকার। তাদের উদ্দেশ্য কি বিচার দেওয়া, অপরাধ আটকানো? নাকি তাদের উদ্দেশ্য অপরাধ যারা করছে তাদের আড়াল করা? যদি সেটা উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে কোনও খুনের ঘটনাকে আগেই আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে কেন? পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি বা হাথরসের ঘটনা, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের ঘটনা— সর্বত্রই কেউ মুখ খুলতে চাইলেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে তার পরিবারের লোককে। এ কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের সর্বত্রই আজ এমন ঘটছে। সঠিক তদন্তে হয়তো উঠে আসবে ২০০১ সালের ঘটনার সঙ্গে এ বারের ঘটনার কোনও যোগসূত্র আছে কি না! কিন্তু প্রতিটি শাসক দলেরই যে মোটিভ— অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও সূত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির মদতে অপরাধ ঘটে থাকলে সেই অপরাধীদের আড়াল করা, আমরা এরই প্রতিবাদ করছি।

ঘটনার পর ২৩ দিন পার হয়ে গেল। সিবিআই-ও ১৯ দিন হয়ে গেল তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে। অথচ এখনও পর্যন্ত সিবিআই জনসমক্ষে কোনও তদন্তের অগ্রগতির কথা জানায়নি। যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট তাদের তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে, তাই ব্যাপারটা সুপ্রিম কোর্ট আর সিবিআই-এর মধ্যেকার বিষয়, ব্যাপারটা তো এরকম নয়! কারণ কোটি কোটি মানুষ গভীর উদ্বেগে অপেক্ষা করছেন এই তদন্তের ফলের জন্য। অথচ এই যে তদন্তের তেমন কিছু অগ্রগতি হল না, এর ফলে একটা অংশের মানুষের মধ্যে এ রকম একটা ভাবনা তো আসতে পারে যে, এত মিছিল, এত আন্দোলন হল, এত লড়াই হল, কিন্তু কিছুই তো হল না! এ ব্যাপারে আপনারা কী বলবেন?

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্ভয়া তহবিলের অর্থ খরচই সার, বছরে গড়ে ধর্ষিতা প্রায় ২৯ হাজার

নয়াদিল্লি ঃ আর জি কর কাণ্ডে দেশজুড়ে চলছে প্রতিবাদ। স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নির্ধারণে টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। ঠিক একই ভাবে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলে দিয়েছিল ২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়া গণধর্ষণের মামলা। গোটা দেশে মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়াতে ২০১৩ সালে গঠিত হয়েছিল নির্ভয়া তহবিল। এই তহবিলের টাকা খরচে সুপারিশের জন্য ২০১৫ সালে গড়া হয়েছিল একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি কতটা বদলেছে? ২০১৫ সালে ওই কমিটি গঠনের পর বছরে গড়ে ২৮ হাজার ৯৭২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুরোর (এনসিআরবি) তরফে এই তথ্যই সামনে এসেছে। নির্ভয়া তহবিলে বরাদ্দ সত্ত্বেও ২০১৫ থেকে ২০২২ পর্যন্ত দেশের সামাজিক পরিসংখ্যান বলছে, ধর্ষণের মামলা কমেছে মাত্র ৯ শতাংশ।

চলতি বছরের ২ আগস্ট লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র জানায়, নির্ভয়া তহবিলের আওতায় এখনও পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ২১২.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য ও মন্ত্রকের তরফে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার ৫১২.৫৭ কোটি টাকা (প্রায় ৭৬ শতাংশ অর্থ). বরাদ্দ হওয়া টাকা খরচের নিরিখে প্রথমে তিনে রয়েছে যথাক্রমে দিল্লি (৯৭.৯ শতাংশ), লাক্ষাদ্বীপ (৯২.৬ শতাংশ) ও তামিলনাড়ু (৯২.৪ শতাংশ)। চতুর্থ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বরাদ্দ হওয়া ১০৪.৭২ কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খরচ করেছে ৯৫.৩২ কোটি টাকা (৯১.২ শতাংশ)। (বর্তমান ঃ ২২.০৮.'২৪)

সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের জলপথ অবরোধ

আর জি করের ধর্ষণ হত্যার ন্যায়বিচার চেয়ে আওয়াজ উঠল নদীর বুকেও। ২৯ আগস্ট সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে বন বিভাগের রামগঙ্গা রেঞ্জের চুলকাটি ক্যাম্পে মৎস্যজীবীরা নৌ-যান নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা তাঁদের পেশাগত দাবিগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান। তাঁদের দাবি— সুন্দরবনের নদী ও খাড়িতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার অধিকার বহাল রাখতে, যে সমস্ত মৎস্যজীবীর মাছ ধরা বন্ধ করা হয়েছে তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বাঘ, কুমির, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত মৎস্যজীবী পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে, বনদপ্তরের অত্যাচার জুলুম হয়রানি ও জরিমানা নেওয়া অবিলম্বে বন্ধকরতে হবে। তাঁরা দাবি করেন, আর জি কর মেডিকেল কলেজে অত্যাচারিত ও নিহত ট্রেনি ডাক্তারের বিচার অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

এই বিক্ষোভ কর্মসূচির কথা আগাম জানানো সত্ত্বেও ক্যাম্পের তালা বন্ধথাকায় চুলকাটি প্রোটেকশন ক্যাম্প ও সংলগ্ন নদী অবরোধ করে রাখেন মৎস্যজীবীরা। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, ৪ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার সুন্দরবনের সমস্ত বিট অফিস, রেঞ্জার অফিসে উল্লেখিত দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ চলবে। এই বিক্ষোভে রায়দিঘি-পাথরপ্রতিমা-নামখানা-কাকদ্বীপ-কুলতলী-ক্যানিং-বাসন্তী-গোসাবা থেকে শত শত মৎস্যযান সহ মৎস্যজীবীরা সামিল হন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের সম্পাদক হারাধন ময়রা, সভাপতি অমল সাউ সহ অন্যান্যরা।

২৮ আগস্ট ২০০০, চা-বাগান মালিকদের পোষা গুণ্ডাদের হাতে খুন হন শ্রমিক নেতা কমরেড তন্ময় মুখার্জী। তাঁর ২৫তম শহিদ দিবসে শিলিগুড়িতে স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য এবং তাঁর ভাই তাণ্ডব মুখার্জী।

আন্দোলন না হলে পুলিশ নড়ে না, বলছে বম্বে হাইকোর্ট

স্কুলে শিশুরা নিরাপদ নয়, হাসপাতালে ডাক্তাররা! দেশজুড়ে এ কেমন শাসন? এ কেমন প্রশাসন? ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ। শুধু আর জি কর নয়, মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শৌচাগারে সাড়ে তিন-চার বছরের দুই শিশুর যৌন নিগ্রহের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে মহারাষ্ট্র। হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে এসে রাস্তা, রেল অবরোধ করেছেন। তারপর পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ১২ এবং ১৩ আগস্ট। স্কুলের শৌচাগারের ভিতরে এক পুরুষ সাফাইকর্মী ওই দুই শিশুকন্যাকে নির্যাতন করে। প্রথমে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ এই বর্বরতা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ঘটনার ভয়াবহতা এবং জনতার ক্রোধ লক্ষ করে বম্বে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছে। ২২ আগস্ট শুনানির সময় বিচারপতি রেবতী মোহিতে দেরে এবং বিচারপতি পৃথ্বীরাজ চ্যবনের ডিভিশন বেঞ্চ ক্ষোভের সাথে বলেন, এত বর্বর ঘটনায় এফআইআর দায়ের হল চার দিন পরে! কেন এই বিলম্ব? কাকে বাঁচাতে, কীসের স্বার্থে পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তা?

পাঁচদিন সময় কাটিয়ে অবশেষে গণআন্দোলনের চাপে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোট সরকার। সেই সরকারের পুলিশ অপরাধ চাপা দেওয়ার কাজে যা করছে, তা থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশও শিক্ষা নিতে পারে! পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা আর জি কর কাণ্ডে যখন ক্যামেরার সামনে প্রবল লাফালাফি করছেন, তখন মহারাষ্ট্রের ঘটনায় তাঁরা নীরব। মেয়েদের সুরক্ষা, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার চেয়ে গদির খোয়াবই তাঁদের চালনা করছে বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু জনগণ! তাঁরা তো সত্যিই আন্দোলন চাইছে। তাই আর জি কর নিয়ে মানুষ যেমন আওয়াজ তুলেছে— বিচার চাই। বদলাপুরেও পুলিশকে বাধ্য করেছে নড়ে বসতে। সরকারকে কটাক্ষ করে ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'যতক্ষণ না রাজপথে বড় ধরনের গণবিক্ষোভ হচ্ছে, ততক্ষণ তো পুলিশ প্রশাসন নড়েই না! বদলাপুরের মতো গণবিক্ষোভ না হলে কি সরকারও কিছুই করবে না?' (দ্য টেলিগ্রাফ ঃ ২২ আগস্ট ২০২৪) ডিভিশন বেঞ্চের আরও ক্ষোভ, 'পুলিশ কেন বিষয়টিকে হাল্কাভাবে নিল? স্কুল যদি শিশুদের নিরাপদ জায়গা না হয় শিশুরা কী করতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গের আর জি কর এবং মহারাষ্ট্রের বদলাপুর— উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা দোষীদের আড়াল করার পক্ষেই। আর জি করের ঘটনার তদন্ত এখন সিবিআইয়ের হাতে। একদা সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল, সিবিআই কেন্দ্রের হাতে খাঁচার তোতা। তার কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সিবিআই তদন্ত হাতে নেওয়ায় পর ১৯ দিনের মাথাতেও বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। এই অবস্থায় জনগণ প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের হাতে সমস্ত আস্থা অর্পণ করে ন্যায় বিচারের আশায় বসে থাকলে তদন্ত কি এগোবে? দেখা গেল আদালতকেও বলতে হল জনগণ রাস্তায় না নামলে পুলিশ নড়ে বসবে না। অবশ্য আজকের দিনে ন্যায় বিচার পেতে গেলে, বিচারবিভাগের ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গেলেও যে গণআন্দোলন ছাড়া রাস্তা নেই তা জনগণ অভিজ্ঞতা থেকেই জানে।

গণবিক্ষোভ না হলে সরকার কিছু করবে না— তেমনি গণবিক্ষোভ স্তিমিত হলে ন্যায় বিচারও হবে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, কেন্দ্রের কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতির বিষয়টি। প্রায় এক বছর ধরে দিল্লির রাজপথ দখল নিয়ে কৃষকরা যে ঐতিহাসিক আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনের চাপেই সুপ্রিম কোর্ট তা সাময়িকভাবে স্থগিত করে কমিটি করেছিল। পরে সরকার তা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। রাজপথের আন্দোলন এমনই শক্তিমান। এই আন্দোলনকে রাজপথ থেকে পাড়া পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। আশার কথা, আন্দোলন এভাবেই এগোচ্ছে।

ছাত্রী ধর্ষিতা বিজেপি শাসিত আসামে

আসামের নগাঁও জেলার ধিং-এ ১৪ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা ২২ আগস্ট সন্ধ্যায়। মেয়েটি নগাঁও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।

এর বিরুদ্ধে সমগ্র আসামের ছাত্রছাত্রী, মহিলা, যুবক-যুবতী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। ২৩ আগস্ট এ আই ডি এস ও, এ আই এম এস এস এবং এ আই ডি ওয়াই ও উলুবাড়িতে বিক্ষোভ দেখায়।

২৫ আগস্ট ছাত্রছাত্রী, মহিলা এবং প্রতিবাদী মানুষ সমবেত হয়ে গুয়াহাটির বীরুবাড়িতে মোমবাতি মিছিল করেন। প্রতিবাদীরা ধিং সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের ফাঁসির দাবি সহ মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, নারীহত্যা-ধর্ষণ বন্ধ করা, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে মহিলাদের উপরে সংগঠিত হওয়া সব ধরনের নির্যাতনের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, ধর্ষণের মতো মর্মান্তিক ঘটনাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করার দাবিতে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে
মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শত শত মানুষ বিক্ষোভে সামিল হলেন। ২৯ আগস্ট এস ইউ সি আই (সি)-এর মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির ডাকে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কৃষক, শ্রমিক, অফিস কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র-যুবক-মহিলা মিছিল করে ভোপালের শাহজাহানি পার্কে সমাবেত হন। সেখানে শুরু হয় বিক্ষোভ সমাবেশ।

সারা দেশের মতোই মধ্যপ্রদেশেও নারী নির্যাতন, শিশুকন্যার উপর নির্যাতন-ধর্ষণ ঘটেই চলেছে। তার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। তাঁরা ৯৪ হাজার সরকারি স্কুল তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করার দাবি জানান। বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্যপরিষেবা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং পুনর্বাসন না দিয়ে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান তাঁরা।

কমরেড প্রতাপ সামল গণআন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাম অবতার শর্মা। বিভিন্ন পেশার মানুষের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে একাধিক স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বনের অধিকারের দাবিতে বিক্ষোভ ওড়িশায়

২৮ আগস্ট এআইকেকেএমএসের ডাকে ওড়িশার সাহারপড়া তহসিল অফিসের সামনে শত শত কৃষক বিক্ষোভ দেখান। জমির পাট্টা প্রদান, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ইত্যাদি স্লোগান তুলে মিছিল সাহারপড়া পেট্রল পাম্প থেকে শুরু হয়ে তহসিলদার অফিসের সামনে পৌঁছায়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজ্যের বিজেপি সরকার আদিবাসী জনগণের দখলে থাকা জমি কী ভাবে ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে।

বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রকাশ মল্লিক, সংগঠনের কেন্দুঝর জেলা সম্পাদক কমরেড বেণুধর সর্দার, সংগঠনের প্রবীণ সদস্য কমরেড খগেশ্বর মহান্ত, প্রতাপ চন্দ্র নায়ক, হরিহর মুন্ডা প্রমুখ।

জঙ্গল জমি অধিকার ২০০৬ আইন অনুযায়ী পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করা জমির পাট্টা প্রদান, বন তৈরির নামে চাষের খেত থেকে চাষিকে উচ্ছেদ বন্ধ করা, রাস্তার দু-দিকে গাছ লাগানো দ্রুত শেষ করা, জঙ্গল সংরক্ষণ সংশোধন আইন ২০২৩ সম্পূর্ণ বাতিল করা ইত্যাদি দাবিতে তহসিলদারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কী বলছেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা

চারের পাতার পর

কিছুই হল না, এটা আমরা মানতে রাজি নই। আমরা তো অনেক পজিটিভ দিক দেখতে পাচ্ছি এই আন্দোলনের মধ্যে। প্রথমটা হল, আগেই যে কথা বলেছি— আন্দোলনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এটা আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমার সিনিয়রদের কাছ থেকেও শুনছি যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এই বিশাল গণজাগরণ, মানুষের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাস্তায় নামাটাও খুব বিরল ঘটনা। ফলে এই আন্দোলনের একটা খুব বড় সাফল্য হল, আমরা একটা দাবিকে গোটা সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের দাবির সঙ্গে মেলাতে পেরেছি। মানুষ এই দাবির সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে প্রতিদিনই রাস্তায় নামছেন, প্রতিবাদ করছেন। অন্যান্য অন্যায় দেখেও মানুষ প্রতিবাদ করছেন। কিছু ঘটনা আমরা লক্ষ করছি। আজকেই কলকাতায় সিঁথির মোড়ে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পথ অবরোধ করেছে। কেন? না, একজন সিভিক পুলিশ সেখানে মদ্যপ অবস্থায় খারাপ আচরণ করেছে।

গোটা সমাজ জুড়ে যে আন্দোলন চলছে এবং আপনারা চিকিৎসক ও ছাত্ররা যে আন্দোলন করছেন, যদি সেই আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়, তা হলে কি তদন্ত দুর্বল হবে বলে আপনারা মনে করেন?

প্রথম কথা, আন্দোলন যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে, এই আন্দোলনের স্রোত যাতে সমাজের প্রতিটি কোণে পৌঁছয়, প্রতিটি মানুষের কাছে যায়, সে জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের যে ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে, তারা সদা সচেষ্ট আছে। ফ্রন্ট চাইছে, আগামী দিনে যাতে সমাজে এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ আর না ঘটে, এই আন্দোলন থেকে মানুষের কাছে সেই বার্তাই যাক। সে জন্য আন্দোলনকারী ডাক্তাররা চাইছেন আন্দোলনটাকে এমন একটা রূপ দিতে, এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে যাতে মানুষ প্রতিবাদ জানাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, যাতে এই আন্দোলন চলতেই থাকে। আমরা মনে করি, এই আন্দোলন একটা পর্যায়ে গিয়ে শেষ হলেও তার প্রভাবটা সমাজে থেকে যাবে। এই আন্দোলন একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন। এই আন্দোলন মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, প্রতিবাদের ভাষার জন্ম দিয়েছে, মানুষ যে ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসেছেন, তার রেশ কিন্তু আগামী দিনেও থাকবে বলে আমরা মনে করি। আমরা যদি মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের এই উদ্দীপনা বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে আগামী দিনে সমাজ থেকে অপরাধ কমবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দেশজোড়া যে বিরাট জনআন্দোলন তথা সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এর সাথে কোনও ভাবে সংযোগ স্থাপনের কথা কি আপনারা ভাবছেন?

অবশ্যই। আমরা ইতিমধ্যেই রাখীবন্ধন উৎসবের দিন অভয়ার নামে রাখী পরানোর কর্মসূচি নিয়েছিলাম। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেটা সফল ভাবে হয়েছে। 'মেয়েদের রাত দখলে'র কর্মসূচিতে সমস্ত মানুষ সামিল হয়েছেন। ৪ সেপ্টেম্বর জুনিয়র ডাক্তারদের ফ্রন্ট একটা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছে, ওই দিন যেন তারা রাত ৯-১০টা ঘরের আলো বন্ধ রাখেন, মোমবাতি বা প্রদীপ হাতে বাড়ির সামনে মানববন্ধন তৈরি করেন। যাতে এটা একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হয়, যাতে সুপ্রিম কোর্টের নজর কাড়ে যে, সারা দেশের মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ করছে এবং দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দাবি করছে। আমরা বিভিন্ন জায়গাতে কমিটি গঠন করার কথাও ভাবছি, আমাদের চিকিৎসকদের প্রতিনিধি রেখে নানা অংশের মানুষের মধ্যে। যতদিন না আমরা বিচার পাচ্ছি, ততদিন যাতে এই আন্দোলন দীর্ঘায়িত হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নিয়ে একটা অংশের মানুষের মধ্যে কিছু প্রশ্ন আছে। মিডিয়ার একটা অংশ কিছু প্রশ্ন তুলছে। এ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। আমরা যদি জানতে না পারি কে বা কারা ধর্ষক, কে বা কারা খুনি এবং তারা যদি অ্যারেস্ট না হয়, সেই খুনি-ধর্ষকরা কলেজের মধ্যে বা আশেপাশে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে এটা জানার পরও একজন ডাক্তার, আমাদের জুনিয়র বা সহকর্মী কী সুরক্ষার ভরসা নিয়ে আবার ডিউটি করবে? এই ঘটনার মোটিভ কী ছিল, উদ্দেশ্য কী ছিল? এর পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা যতক্ষণ না উদঘাটন হচ্ছে এবং দোষীরা যতক্ষণ না চিহ্নিত হচ্ছে, কোনও সুরক্ষাই আমাদের সুরক্ষিত করতে পারবে না। এরকম পরিস্থিতিতে কর্মবিরতিটা জুনিয়র ডাক্তাররা করছেন। কিন্তু সিনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি করছেন না। তাঁরা অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে পরিস্থিতি সামলাচ্ছেন।

এটাও বলতে চাই, জুনিয়র ডাক্তাররা সত্যিই কাজে ফিরতে চান। তারা কাজ করতেই এসেছেন, চিকিৎসা পরিষেবা দিতেই এসেছেন, সেই জন্যই কাজ শেখা। কিন্তু কাজের অনুকূল পরিবেশটা যদি না থাকে, তারা কাজ করবেন কী ভাবে? আর জুনিয়র ডাক্তাররা আজকের দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ নয়, তারা একটা অংশ। তা সত্ত্বেও পরিষেবা অনেকটাই জুনিয়র ডাক্তারদের উপর নির্ভর করে। তার কারণ আজ প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতালে আরএমও, শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রচুর পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে না বছরের পর বছর। যদি উপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসক নিয়োগ করা হত, তা হলে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল দশা হত না। এই যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিছুটা অর্থে ব্যাহত হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কিন্তু প্রশাসন, সরকার এবং বছরের পর বছর ধরে নিয়োগ না করার নীতি।

সরকার তথা প্রশাসন সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারেনি। জুনিয়র ডাক্তাররাও অতি দ্রুত কাজে ফিরতে চান, পরিষেবা দিতে চান। তাঁরা আলোচনা করছেন কী ভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করে কাজে ফেরা যায়। এ সত্ত্বেও তারা অবস্থানে রয়েছেন। কারণ, তাঁরা কাজে ফিরলে আগামী দিনে যে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না, তার গ্যারান্টি কিন্তু নেই। এই আন্দোলন চলতে চলতেই এসএসকেএম হাসপাতালে আরএমও ডাক্তারের উপর, সিনিয়র ডাক্তারের উপর হামলা হয়েছে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নার্সের উপর হামলা, মালদা মেডিকেল কলেজে হামলা, পিয়ারলেস নার্সিংহোমে এমার্জেন্সির একজন ডাক্তারকে একদল লোক বলে গেল 'আর জি কর বানিয়ে দেব'— একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। এর দায় কে নেবে? ডাক্তারদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দেবে? যতক্ষণ না দোষীদের শাস্তি হচ্ছে, মোটিভটা সামনে আসছে, ততক্ষণ এই আন্দোলন চলবে।

এই যে আপনারা আন্দোলন করছেন, আন্দোলনে আপনারা সিনিয়র ডাক্তারদের, শিক্ষক চিকিৎসকদের অধ্যাপকদের তথা শিক্ষকদের সহযোগিতা কেমন পাচ্ছেন?

সহযোগিতা আমরা প্রথম দিন থেকেই পাচ্ছি। তাঁরা বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে চিকিৎসা করছেন। হাসপাতালে ওপিডি চলছে, এমার্জেন্সি চালু আছে। তাঁরা সেখানে চিকিৎসা করছেন, তার পাশাপাশি আন্দোলন মঞ্চে এসেও সংহতি জানাচ্ছেন। আমাদের ডাকা মিছিলেও তারা অনেক সময় পা মেলাচ্ছেন। তাঁদের যথেষ্ট সমর্থন আমাদের প্রতি রয়েছে। আমরা সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছি। এই আন্দোলন নৈতিক ভিত্তি পেয়েছে। আমাদের আশা, ন্যায়বিচার মিলবেই।

দিনহাটায় আন্দোলনকারীদের উপর তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হামলা

৯ আগস্ট থেকে রাজ্য তোলপাড় আর জি কর কাণ্ড নিয়ে। রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি দিনহাটাতেও পালিত হয় শান্তিপূর্ণ ভাবেই। ১৪ আগস্ট রাত দখলের কর্মসূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর হুমকি এবং বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শন। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে কর্মসূচিটি ভণ্ডুল করতে পূর্বঘোষিত রাত দখলের কর্মসূচির স্থানটিতেই তারা তাদের মহিলাদের জমায়েতের ডাক দেয়। এই সংবাদ জানতে পেরে দিনহাটায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে নতুন করে স্থান ও সময় ঘোষণা করে কর্মসূচিটি সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। ১৯ আগস্ট রাজ্য জুড়ে 'আমার রাখী তাদের হাতে, যাদের কণ্ঠ প্রতিবাদে' কর্মসূচি বন্ধ করতেও তারা নানা অপকৌশল নেয়। দিনহাটা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল কর্মী কর্মসূচি বন্ধ করতে না পেরে সংগঠকদের আক্রমণ করে। ২৮ তারিখ আন্দোলনকারীরা একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করলে শাসকদল সরাসরি বাধা দেয়।

৩০ আগস্ট দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ে টিএমসিপি একটি মিছিলের আয়োজন করলে বেশ কিছু ছাত্রী মিছিলে যেতে অসম্মত হন। ক্ষিপ্ত হয়ে টিএমসিপি গার্লস কমনরুমে তাঁদের তালাবন্ধ করে রাখে। এতে একজন ছাত্রী আতঙ্কিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

৩১ আগস্ট এক আন্দোলনকারী ছাত্রীকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হলে সেই ছাত্রী আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে নিয়ে দিনহাটা মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান। সেই সময় একটি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জেরক্স করতে থানার পাশেই এক দোকানে যান অন্যতম আন্দোলনকারী, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মী আজিজুল হক। সেই সময় অতর্কিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকে। এতে তিনি জখম হন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। দিনহাটা থানায় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে দলের কোচবিহার জেলা কমিটি।

শিক্ষা কনভেনশন মুরলীধর গার্লস কলেজে

২২ আগস্ট এআইডিএসও মুরলীধর গার্লস কলেজ ইউনিটের ডাকে আর জি করের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার্থে এবং সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড পিন্টু দাস, ছাত্রনেত্রী কমরেডস অনুমিতা পানি, অপর্ণা ওঝা, অনুশ্রী নস্কর।

৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রছাত্রীদের কলকাতার রাজপথ দখলের আহ্বান ওঠে কনভেনশন থেকে। কমরেড সঙ্গীতা হালদারকে ইউনিট সভাপতি ও কমরেড সৃজনী চক্রবর্তীকে ইউনিট সম্পাদক নির্বাচিত করে ৪৮ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি দেউলিয়ায়

পূর্ব মেদিনীপুরের দেউলিয়া বাজারে জাতীয় সড়কে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবিতে দেউলিয়া বাজার ফ্লাইওভার কাম সাবওয়ে নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ২৭ আগস্ট ওহীরারাম হাইস্কুলে কনভেনশন হয়। কনভেনশনে এলাকার পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি, স্কুল, ক্লাবের প্রতিনিধি সহ দেড় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন শেষে বাজারে মিছিল হয়। ২০১৫ সালে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দেউলিয়া বাজারে আন্ডারপাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর প্রায় ৬০-৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জমি অধিগ্রহণ, দু'পাশে সার্ভিস রোড এবং বাজার সরিয়ে নেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী পানশিলায় ছাউনিযুক্ত বাজার নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এখনও আন্ডারপাস নির্মিত না হওয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। অতি দ্রুত তা নির্মাণ না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।

এসইউসিআই(সি)-র অভিনন্দন

একের পাতার পর

গর্জে উঠল। এ চিত্র অভূতপূর্ব, অসাধারণ। ভারতে স্বদেশি আন্দোলনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এটা দেখা যায়নি। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। এ যেন বিপ্লবী কবি নজরুলের 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা' মূর্ত হয়ে উঠেছিল সে দিন পশ্চিমবঙ্গে। দিল্লির সিংহাসনে, পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যের কুর্সিতে আসীন ক্ষমতা মদমত্ত শাসকরা এই জাগ্রত নারীশক্তির প্রতিবাদের ভাষা হয়তো অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু এটা আগামী দিনের গণআন্দোলনে প্রেরণা যোগাবে। একের পর এক এইসব সংগ্রামী কর্মসূচিতে সামিল সকলকেই আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই নারকীয় বীভৎস ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে কী না করেছে সরকার এবং তার পুলিশ প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ! হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যা বলেছিল এবং প্রমাণ লোপাট করার সব রকম ষড়যন্ত্র করেছিল। ১৪ আগস্ট গভীর রাতে রাস্তায় যখন গণ প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় দুষ্কৃতীরা আর জি করের এমার্জেন্সি বিভাগে হামলা চালাল। ভেঙে দিল দামি দামি মেসিন, যন্ত্রপাতি। চলে যাওয়ার সময় ডিউটিরত নার্সদের নোংরা ইঙ্গিত করে হুমকি দিয়ে গেল, 'এখন গেলেও আবার ফিরে আসছি, তখন দেখে নেব।'

বিচার করে দেখুন, কারা এই হামলা করতে পারে? শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে কি এসবের দ্বারা? এই হামলার বিরুদ্ধে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সেই দিন মধ্য রাতেই ১৬ আগস্ট সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে। মাঝে প্রচারের একটাই দিন—১৫ আগস্ট। সেদিন আবার পুরো ছুটি। এত অল্প সময়ের প্রচারেও জনগণ যে ব্যাপক ভাবে সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন— এই রাজ্যে ধর্মঘট চলবে না। তিনি জেনে রাখুন, কংগ্রেস শাসনে এ রাজ্যে বিভিন্ন বামপন্থী দলের সাথে যুক্তভাবে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জনগণের দাবিতে ধর্মঘট করেছে বহুবার। সিপিএম শাসনকালেও আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একক ভাবে নানা দাবিতে ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ১১ বার ধর্মঘট করেছে। এ বারেও প্রয়োজনে হুমকি উপেক্ষা করেই জনস্বার্থে ১৬ আগস্ট ধর্মঘট করার আবেদন জানাই। কারণ এটা স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকেই অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকারকে পদদলিত করে পুলিশ মিথ্যা মামলায় আটক করে রেখেছে ধর্মঘটের কর্মীদের।

আর জি করের ঘটনাও নতুন নয়। এ রাজ্যে তৃণমূল শাসনে পার্কস্ট্রিট, কামদুনি সহ আরও বেশ কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যার কোনও বিচার, শাস্তি হয়নি। ইতিপূর্বে সিপিএম শাসনকালে শুধু বানতলাই নয়, আরও বহু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষে সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ করিয়েছে। বিজেপি ও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতেও বহু ধর্ষণ ও খুনের খবর প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ নারী ধর্ষণে ও খুনে এবং পশ্চিমবঙ্গ নারী পাচারে দেশে শীর্ষস্থানে। সিপিএম শাসিত কেরালাতেও যৌন নির্যাতনের, ধর্ষণের অভিযোগ উঠছে। নিজ নিজ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তারা তো আন্দোলন করছে না!

এ বার গণআন্দোলনের চাপে হয়ত ধর্ষকরা, ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়বে, শাস্তি পাবে, আবার নাও হতে পারে। আমরা সকলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি। সাথে সাথে আমরা এ কথাও বলতে চাই— এ দেশে প্রতি রাজ্যেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ইভটিজিং, কিডন্যাপিং, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন চলছে এবং বেড়েই চলেছে।

কেন এসব হচ্ছে? কোনও শিশু তো ধর্ষক হয়ে জন্মায় না, জন্মলগ্ন থেকে মানবিক গুণাবলি নিয়েও আসে না। মানবিক গুণাবলি অর্জিত হয় সমাজ পরিবেশ থেকে। দেশের ছাত্র-যুবকরা একদিন ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েছে, স্বাধীনতার দাবিতে লাঠি-গুলি খেয়েছে, ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে। আজ স্বাধীন দেশের একদল কিশোর-যুবকের মধ্যে এই প্রবণতা এল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৭৪ সালে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছেন মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর। তারা জানে, শত অত্যাচার ও দমনপীড়ন করেও, না খেতে দিয়েও একটা জাতিকে, একটা দেশের জনসাধারণকে শুধু পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে বেশি দিন পদদলিত রাখা যায় না। ...যদি জনশক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যদি তারা সঠিক বিপ্লবী আদর্শের হদিশ পায় এবং তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে। ... ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা, শাসক সম্প্রদায়ের...শয়তান শাসক শোষক হিসাবে ... কার্যকরী শিক্ষাটি কিন্তু ঠিক তারা নিয়েছে। সেটি হচ্ছে— জাতির নৈতিক বল খতম করে দাও, জাতির চরিত্রকে মেরে দাও। তা হলে তারা না খেতে পেয়েও ... গুমরাতে থাকবে, ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে, ... কিন্তু সংগঠিত বিপ্লবের রূপ দিতে পারবে না।" এই সতর্কবাণী আজ মর্মান্তিক বাস্তব হিসাবে দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, নজরুল, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, দেশবন্ধু, তিলক, লালা লাজপত, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, চন্দ্রশেখর আজাদেরা পর্যায়ক্রমে যুবশক্তিকে নূতন নৈতিক বলে বলীয়ান করেছেন। আজ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ও তার সেবক সরকারি দলগুলির ষড়যন্ত্রে এইসব মহান চরিত্রগুলিকে বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করা হয়েছে, নৈতিক বল খতম করার হীন উদ্দেশ্যে। উৎসাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে মদ্যপানে, ড্রাগ অ্যাডিকশনে, জুয়া-সাট্টা খেলায়, নারী দেহ নিয়ে নোংরা আলোচনায়, যৌনতা উত্তেজক ব্লু-ফিল্ম ও নানা অশ্লীল চিত্র দেখতে মত্ত রাখায়। এই ধরনের বিবেক-মনুষ্যত্বহীন একদল যুবক শাসক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় টাকার বিনিময়ে খুন করে, ভোটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, পুলিশ টুঁ শব্দও করে না। এরাই শোষক পুঁজিবাদের সৃষ্টি, এরাই পুঁজিবাদের রক্ষক। তাই যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, অন্যান্য সংকটের মতো এই ধর্ষণ ও খুনের সংকটও থাকবে।

তাই বলে কি অসহায় হয়ে চুপ করে থাকতে হবে? নিশ্চয়ই তা নয়। তাই এখন যে আন্দোলন চলছে, এ রকম আন্দোলন প্রয়োজনে বারবার করতে হবে। একই সাথে অত্যন্ত প্রয়োজন, পূর্বোক্ত মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রামের শিক্ষায় প্রতি শহরে ও গ্রামে কিশোর ও যুবকদের অনুপ্রাণিত করা, পাড়ায় পাড়ায় রবিবার ছুটির দিন কিশোরদের নিয়ে খেলাধূলা, গান, নাটক, মনীষী ও বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনা। এ ভাবে তাদের জীবন-প্রভাতে শিক্ষিত করা। আর অত্যন্ত প্রয়োজন প্রতিটি পাড়ায় দলমত নির্বিশেষে সৎ-সাহসী পুরুষ-নারীদের নিয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা ও ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা, যারা যে কোনও মুহূর্তে বিপন্ন নারীকে রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করবে। আমরা সর্বস্তরের নাগরিকের কাছে আবেদন করছি, সকল দলের সৎ কর্মী-সমর্থকদের কাছেও আবেদন করছি, আপনারা অবশ্যই এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুন। না হলে কেউ কোনও দল করুন বা না করুন, আমাদের পরিবারের কন্যাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নেই। আমাদের পরিবারের পুত্র সন্তান যে বিপথগামী হবে না, তারও গ্যারান্টি নেই।

এই মুহূর্তে আসুন স্মরণ করি, কবিগুরুর সেই বাণীটি "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে" এবং নেতাজির উক্তি, "স্কুলে-কলেজে, ঘরে বাইরে, পথে-ঘাটে-মাঠে, যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে, সেখানে বীরের মতো অগ্রসর হইয়া বাধা দাও, মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ... আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।" আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলতেন, "ব্যক্তি হিসাবে তুমি যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পার, তা হলে তুমি মানুষ নামেরই যোগ্য নয়।" এই মহৎ শিক্ষাগুলির ভিত্তিতেই আমাদের কর্তব্য নির্ধারিত হোক, এই আমাদের আবেদন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-এর বীরভূম জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড গুণাধীশ দাস দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৮ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৬ আগস্ট হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে রামপুরহাটে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ বজ্রাঘাতের মতো নেমে আসে। গভীর শোক ও বেদনায় অশ্রুসিক্ত নয়নে দলের নেতা-কর্মীরা রামপুরহাট দলীয় কার্যালয়ে সমবেত হতে থাকেন। রাত এগারোটা নাগাদ তাঁর মরদেহ পৌঁছালে গভীর শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রতিবেশীরাও শেষবারের মতো তাঁকে দেখতে উপস্থিত হন। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতির পক্ষে মাল্যদানের পর জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। একে একে দলের সমস্ত কর্মী ও তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। রাতেই তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়ি হয়ে বহরমপুরে যায় ও সেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড গুণাধীশ দাস বহরমপুরে ছাত্র অবস্থায় এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন। ছাত্র সংগঠনের কাজ করতে করতেই এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। ছাত্র জীবনেই দলের কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত হন। ছাত্র জীবন শেষ করে নিজ এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। নিকটবর্তী বীরভূমের বিষ্ণুপুর আর এম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। শিক্ষকতা, দলীয় নানা কর্মসূচির সাথে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ও শিক্ষাদানে যত্নশীলতা তাঁকে জনপ্রিয় শিক্ষকে পরিণত করে। সব সময়ই হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল, আচার-আচরণে অকৃত্রিম বিনয়ী, মিতভাষী, কিন্তু সত্যে অবিচল। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল শিক্ষণীয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান অর্থনীতি নানা বিষয়ের বই। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই চিত্রশিল্পী হিসেবে দক্ষতা অর্জন করেন। বৃদ্ধ বয়সেও দেওয়াল লেখায় অংশ নিতেন। রামপুরহাট ফ্রি কোচিং সেন্টার পরিচালনা, পড়ানো, আবার এর মধ্য দিয়েই একক প্রচেষ্টায় সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। করোনার আগে পর্যন্ত নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনায় তাঁরই ছিল মুখ্য ভূমিকা।

শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা চালুর দাবিতে ১৯৮০-র দশক থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন এসটিইএ-র জেলা সম্পাদক হিসেবে শিক্ষা ও শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা নিয়েও জেলাব্যাপী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।

দলের রামপুরহাট লোকাল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। শয্যাশায়ী অবস্থাতেও বিগত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিগত কয়েক বছরের সংগ্রাম ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। আনন্দের সাথে 'দলই জীবন' এই সংগ্রামে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই সময়ে পরিবারের সদস্যদেরও এই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দলের কাছাকাছি এলে, কোনও কর্মসূচিতে যোগ দিলে খুবই আনন্দ পেতেন। পরিবারের সদস্যদের দলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দল হারাল একজন আদর্শবান, কর্মোদ্যোগী এবং উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন সাথীকে, এলাকার অগণিত মানুষ হারাল তাদের আপনজনকে।

কমরেড গুণাধীশ দাস লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 6 Bengali Weekly September 6, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

শহিদ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

- *১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলনে কংগ্রেস সরকারের পুলিশী আক্রমণে নিহত শহিদদের স্মরণে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য (ডানদিকের ছবি)।*
- *১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে সিপিএম সরকারের গুলিতে নিহত কিশোর শহিদ মাধাই হালদারের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কলকাতার এসপ্ল্যানেডে।*

বিচারের অঙ্গীকারে বহ্নিশিখারা

একের পাতার পর

প্রতিকূলতাকে জয় করে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন, হয়ে উঠেছেন সংগ্রামের প্রেরণা। অথচ যাদের সুস্থ-সুন্দর আলোকিত জীবন, সমাজে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার দাবিতে তাঁদের এই সংগ্রাম, সেই মেয়েদের আজও প্রতিনিয়ত লড়তে হয় একটু শ্বাস নেওয়ার জন্য। একবিংশ শতাব্দীতে এই কলকাতার বুকে, স্বাধীনতার মাসেই নারকীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে নিজের কর্মক্ষেত্র হাসপাতালের মধ্যে ধর্ষিত এবং খুন হলেন এক চিকিৎসক তরুণী। বরাবরের মতোই সরকার-পুলিশ-প্রশাসন দ্রুত অপরাধীদের খুঁজে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার বদলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অপরাধীদের আড়াল করতে। নানা টালবাহানায় ক্রমশ বিলম্বিত হতে থাকছে ন্যায়বিচার। অন্য দিকে এই সুযোগে ক্ষমতার গদি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সেইসব রাজনৈতিক দল, যাদের নিজেদের শাসনাধীন রাজ্যে নারী সুরক্ষার চেহারা ভয়াবহ। এই কুৎসিত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির আবহে আন্দোলনের ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছেন এই রাজ্যের সচেতন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। প্রতিদিন অজস্র সভা, মিছিল, অবরোধ থেকে আওয়াজ উঠছে— 'আমরা বিচার চাই। ধর্ষকের শাস্তি চাই'। এই দাবিতেই ২৯ আগস্ট মহিলাদের ডাকে 'অঙ্গীকার যাত্রা' দেখিয়ে দিল, স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর পার করে নারীদের যখন বিচার চেয়ে, নিরাপত্তা চেয়ে পথে নামতে হয়, তাঁরা এমন তুফান তুলেই পথে নামেন।

ভাদ্রের কড়া রোদ উপেক্ষা করে কলেজ স্কোয়ার প্রাঙ্গণে সে দিন জড়ো হচ্ছিলেন হাজার হাজার মহিলা। রাজ্যের প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে, গ্রাম-শহর-মফস্বল থেকে এসেছেন তাঁরা। মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন এই কর্মসূচির অন্যতম আহ্বায়ক চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ, অধ্যাপিকা ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেত্রী ভাস্বতী মুখার্জী, ক্রীড়াব্যক্তিত্ব অনিতা রায় প্রমুখ। এ দেশের বুকে যে মানুষটি মেয়েদের শিক্ষার জন্য, তাঁদের অন্ধকারময় জীবনের অবসানের জন্য জীবনপণ করে লড়েছিলেন, সেই বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হল পথচলা। কারও কোলে শিশুসন্তান, কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটছেন লাঠি নিয়ে, কেউ অসুস্থ শরীরে হাঁপিয়ে পড়ছেন, একটু থেমেই আবার চলা শুরু করছেন দ্বিগুণ উৎসাহে। হালিশহর থেকে এসেছিলেন বছর দুইয়ের ছেলেকোলে এক তরুণী। তাঁর ঘামে ভেজা মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। এক প্রৌঢ়া বলে ওঠেন, 'কষ্ট হলেও আসতেই হবে। এ আমাদের বিচার পাওয়ার লড়াই।' অশীতিপর এক বৃদ্ধা হাঁটছিলেন থেমে থেমে। 'হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না মাসিমা?' মলিন আটপৌরে শাড়ি পরা ক্ষীণ দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়— 'যত কষ্ট হোক, আসব, আবার আসব। এ রকম অন্যায়ের একটা বিচার কেন হবে না? আমার মেয়েকে যারা এ ভাবে মারল, তাদের শাস্তি হবে না?' অভয়া বা তিলোত্তমা যে নামেই ডাকি, আর জি করের নির্যাতিতা মেয়েটি এ ভাবেই আজ ঘরে ঘরে প্রতিটি মায়ের মেয়ে হয়ে উঠেছেন। মা-বোনেরা যেন নিজের সন্তান হারানোর শোক বুকে নিয়ে পথে নেমেছেন বিচারের দাবিতে। সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধা, একটি স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা হাঁটছিলেন অন্য একজন মহিলার হাত ধরে। 'এই বয়সেও মিছিলে এসেছেন?' প্রশ্ন শুনে তিনি বলেন, 'বয়সটা কোনও বিষয় নয় ভাই। আজও যদি পথে না নামি, আর কবে, কিসের জন্য নামব বলো!'

দু'পাশের ফুটপাত ছাপিয়ে মহিলাদের ঢল নামছে রাস্তায়, মিছিলের শেষ যখন পৌঁছে গেছে শ্যামবাজার, শেষ প্রান্ত তখনও হেদুয়া পার করেনি। কে নেই মিছিলে? শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, নার্স, আইনজীবী, চিকিৎসক যেমন আছেন, তেমনই আছেন আশাকর্মীদের সংগঠন, পরিচারিকাদের সংগঠন সহ নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মহিলারা। যেদিকে চোখ যায়, আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত আর সহস্র কণ্ঠের সম্মিলিত স্লোগান। যে মেয়েটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে ফুটে ওঠার আগেই ঝরে গেল অমানুষিক বর্বরতার বলি হয়ে, তার সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা হাজার কণ্ঠের দ্রোহের চিৎকার হয়ে উঠেছে সেদিন। অন্যের যন্ত্রণা বুকে বহন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলে যে অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি হয়, তারই স্বাক্ষর দেখল এ দিনের কলকাতা। কলেজ স্ট্রিট, বিবেকানন্দ রোড, হাতিবাগান ধরে মিছিল যখন এগোচ্ছে, দু-পাশের দোকান, বাড়ির বারান্দা, ছাদ থেকে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে দেখেছেন অজস্র মানুষ। এ তাঁদেরও কথা, তাঁদেরও দাবি।

আরজি করের ঘটনা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। সেই ঘটনার পর বিগত কুড়ি দিনে দেশ জুড়ে ঘটে গেছে আরও অজস্র ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, হত্যা। যে দেশে প্রতি পনেরো মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিতা হন, যে দেশের রাজ্যে রাজ্যে প্রতিদিন ঘটে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচারের ঘটনা, সেই দেশে মেয়েদের সুস্থ মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন আরও বহু দূরের পথ। কিন্তু এই দিনের অঙ্গীকার যাত্রা দেখিয়ে দিল, সে পথের শেষ না দেখা পর্যন্ত মেয়েরা রাস্তা ছাড়বেন না। নজরুলের ছবি হাতে নিয়ে তাঁর প্রয়াণ দিবসে যে অঙ্গীকার যাত্রায় তাঁরা সামিল হয়েছেন, আগামী দিনে স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে পড়বে পাড়ায় পাড়ায়, শহরে, গঞ্জে, দেশে। এই অঙ্গীকার আরজি করের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার পাওয়ার অঙ্গীকার, নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার। যে সমাজ ধর্ষক তৈরি করছে, অপরাধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে তাকে ভাঙারও অঙ্গীকার। প্রতিবাদের শক্তি, প্রতিবাদের আনন্দ নতুন করে অনুভব করছেন এই শহরের, রাজ্যের মানুষ।

জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্যোগে চালু হওয়া 'অভয়া ক্লিনিকে' কলকাতার নানা এলাকায় চিকিৎসা চলছে

জলপাইগুড়িতে অবশেষে মুক্ত ২২ জন

'জাস্টিস ফর আর জি কর' এই আওয়াজ তুলে ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি ও মেয়েদের নিরাপত্তার দাবিতে এবং ১৪ আগস্ট রাতে আর জি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের প্রতিবাদে ১৬ আগস্ট এসইউসিআই(সি)-র ডাকা ধর্মঘটের দিন জলপাইগুড়িতে ২২ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১৫ দিন জেল হেফাজতের পর ৩০ আগস্ট মুক্তি পেলেন তাঁরা।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com